নূরুর ফুল

প্রিয় রাসুল সা.

মাসুম মুনতাসির

প্রয়াস প্রকাশন

অর্পণ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী হাফিযাহুল্লাহ

শৈশবে যাঁর বই পড়ে আমার শিশুমনে অঙ্কিত
হয়েছিল প্রিয় নবির ভালোবাসার সবুজ আলপনা।

সূচিপত্র

শুভ্রবরণ কেশ তাঁর ৭

- (নবিজির সম্মানিত দাদা আবদুল মুত্তালিবের জীবনগল্প)

যাবিহুল্লাহ ১৪

- (নবিজির সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহর জীবনগল্প)

মায়াবি জোছনা রাত ২০

- (নবিজির সম্মানিত দুধ-মা হালিমা সাদিয়া রা. এর জীবনগল্প)

পাহাড়ের ওপারেই নীলিম আকাশ.....৩২

- (নবীজীর মদীনা শুভাগমনের গল্পচিত্র)

সাগরপারের দুরন্ত বালক ৩৭

- (নবিজির পালক-পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার জীবনগল্প)

মায়ের হারানো সেই ছেলে ৪৪

- (প্রিয় নবির প্রিয় চাচা আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব রা. এর জীবনগল্প)

মায়াবি জোছনা রাত

(নবিজির সম্মানিত দুধ-মা হালিমা সাদিয়া রা. এর জীবনগল্প)

একমনে দোলনা দোলাতে থাকে শায়মা। শিশু মুহাম্মদ তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শায়মার রঙিন মানসপটে ভেসে উঠতে থাকে মুহাম্মদের সাথে হাসি-খেলায় মেতে ওঠার নানা স্মৃতিচিত্র। হৃদয়ের শাখানদীতে হারানো জলডিঙির মতো ভেসে ভেসে ওঠে কত স্মৃতিভেজা দিনের কথা। স্মৃতির জানালায় উঁকি দেয় সেই রোদেলা দুপুর...

সেদিন বাইরে ছিল আগুনঝরা রোদ। রোদের তাপে যেন পা পুড়ে যায়। কিন্তু এদিনও শায়মা মুহাম্মদকে কোলে নিয়ে বনবাদাড়ে ঘুরতে বেড়োয়। ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে মরুপথ ধরে বেশ খানিকটা দূরে চলে যায় সে।

দিনের আলো মিইয়ে গিয়ে তখন বিকেল। হালিমার কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। ওদের খোঁজে বিভিন্ন বাড়ি চষে বেড়ান। না, কোথাও নেই, গেল কোথায় তবে? খুঁজতে খুঁজতে তিনি অনেকটা পথ হেঁটে যান। দেখেন, দূরে মুহাম্মদকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শায়মা। ওর কপাল থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে।

- এখানে দাঁড়িয়ে কী করছো? আমি তোমাদেরকে হন্য হয়ে খুঁজছি, বললেন হালিমা।

- দেখো মা, আমি ঘামে ভিজে গেছি। কিন্তু আমার এ ভাইটি খুব শান্ত। রোদের উষ্ণতার ওর শরীর স্পর্শ করে না; বরং আমি যতদূর তাকে নিয়ে হেঁটেছি, দেখেছি একখণ্ড পেঁজা পেঁজা মেঘ তাকে ছায়া দিচ্ছে। মেঘের সাথে খেলতে খেলতে কীভাবে যে এত দূরে চলে এসেছি, বুঝতেও পারি নি।[১]

অমন আরও অসংখ্য স্মৃতি শায়মার হৃদয়-সৈকতে নীল ঢেউ তোলে। হৃদয়াকাশে সাতরঙা ঘুড়ির মতো উড়ে বেড়ায়।[২]

হালিমা কতক্ষণ ধরে খেয়াল করছিলেন মেয়ের মতিগতি। তিনি বুঝতে পারলেন, শায়মার আজ মন ভালো নেই। তবুও অনেকটা কৌতুহলেই জিজ্ঞাসা করে বসলেন- তোমায় কেমন মনমরা লাগছে মা, কী হয়েছে বলো তো!

- কিছু হয়নি তো মা! আমি মুহাম্মদকে দেখছিলাম! দেখো না কেমন নাদুস-নুদুস হয়েছে, মনে হয় দশ বছরের বালক! তাই না মা? - সত্যটা মাকে বুঝতে দিতে চায় না শায়মা।

- হ্যারে মা, বিধাতার ওর সবকিছুতেই এক অসাধারণ বিশেষত্ব দান করেছেন। ওর মায়াবি চাহনি, কাজল কালো চোখ, ইষৎ ঢেউখেলানো চুল, যেন স্রষ্টা মনের সবটুকু মাধুরী মিশিয়ে এঁকেছেন ওর রূপ-ছবি! রংতুলির আঁচড়ে এত সুন্দর কারুকাজ আর কেউ পৃথিবীকে উপহার দিতে পারে নি। আমরা তো নিশুতি রাতে তাঁবুর ভেতরে বসে দাদুমণির কাছে শুনতাম ইউসুফ নবির অপরূপ সৌন্দর্যের 'রূপকথা'। কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মুহাম্মদের রূপ-লাবণ্যের কাছে ম্লান ইউসুফের চোখ-ঝলসানো সৌন্দর্য-সুষমা!

- একটানে কথাগুলো বলে একটু থামেন হালিমা।

রাত তখন বেশ গভীর। মরু-যাযাবরদের সবাই তখন ঘুমে বিভোর। কিন্তু শায়মার চোখে ঘুম নামে না। সে একবার চাঁদের দিকে তাকায়, আরেকবার মুহাম্মদের দিকে। জীর্ণ তাঁবুর ফাঁক গলে আসা জোসনার মৃদু আভা খেলা করছে মুহাম্মদের কপালজুড়ে! ওর মনে হয় বিধাতা রুপালি চাঁদের রাশি রাশি জোছনার সবটুকু ছড়িয়ে দিয়েছেন মুহাম্মদের নিষ্পাপ চেহারায়!

পাশ ফিরে ঘুমাবার চেষ্টা করেন হালিমা। শায়মা ডাক দিয়ে বলে- মা, কাল কি সত্যিই মুহাম্মদকে নিয়ে যাবে ওর মায়ের কাছে? আমার না ওকে যেতে দিতে মন চায় না মা! - এবার আর লুকোতে পারে না শায়মা, সত্যটা খুলে বলে মাকে।

- আমারও তো মন চায় না মা! ও আমার ঘরের চাঁদ! আমার সৌভাগ্যের সেতারা! কিন্তু মন না চাইলেও অনেক কিছু করতে হয়! নিয়তির চিরায়ত বিধান শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়!

- আচ্ছা মা, তোমার মনে আছে মুহাম্মদ যখন প্রথম আমাদের ঘরে এসেছিল?

হ্যা, মনে আছে তো! খুব মনে আছে! সেই দিনগুলোর কথা কীভাবে ভুলি? সেই থেকেই তো আমার সৌভাগ্যের সূচনা! এখনও আমার করোটিতে জেগে আছে সেই দিনগুলির স্মৃতি।

- বলো না মা আরেকবার! কতবারই তো শুনেছি, কিন্তু তৃপ্তি হয় না! মুহাম্মদের গল্প কেবল শুনতেই ভালো লাগে। - শায়মার কণ্ঠে ঝরে পড়ে আবদারের সুর।

হালিমা হারিয়ে যান অতীতের মহাসড়কে। স্মৃতির পথ ধরে তিনি ফিরে যান পুরনো দিনগুলিতে। তাঁর কণ্ঠে উঠে আসে অতীতের বয়ান...

আজ থেকে বছর দুই আগে। গ্রীষ্মের খরতাপে তখন ঊষর মরু রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। কদিন যাবত বৃষ্টির কোন আভাস নেই। আকাশে ঝকঝকে রোদ। মেঘ যেন সব হাওয়ায় মিশে গেছে। রোদের প্রখরতায় মাটি ফেটে চৌচির। অনাবৃষ্টির ফলে জমিন শুষ্ক। চারদিকে হাহাকার পড়েছে। নেই খাদ্য-খাবার, নেই পর্যাপ্ত পানি। পশুরাও কদিন যাবত অনাহারে। উট-গাভীর ওলানেও নেই দুধের ছিটেফোঁটা। হালিমার বুকও দুধশূন্য। এ নিয়ে হালিমার ভাবনার কোন অন্ত নেই। এমন দুর্ভিক্ষে কীভাবে ছেলে-মেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে বাস করবেন? ওদিকে গোত্রের অন্যান্য মহিলারা সন্তান দত্তক নিতে মক্কা-সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। হালিমাও এবার যাবার মনস্থ করেছে। কিন্তু পরে কী হবে, সেই ভাবনা তাকে ব্যাকুল করে তুলছে।

ঘরে ঢুকে হালিমা চেহারায় দুশ্চিন্তার রেখা দেখে স্বামী হারিস জিজ্ঞাসা করে- কী এতসব ভাবছো তুমি?

- কাল যে যেতে হবে, তুমি কি সে কথা ভুলে গেছো? - পাল্টা প্রশ্ন করে হালিমা।

- না, সে তো ভুলিনি। আমি বরং সফরের জন্য কিছু খাবার-পানি জোগাড় করে রেখেছি।

- তাহলে কি কালই আমরা যাচ্ছি?

- তা নয়তো কী?

- কিন্তু আমার যে খুব চিন্তা হচ্ছে!

- আমি বলি কী, শোনো- এতসব চিন্তা করে লাভ কী? দেখবে ব্যবস্থা একটা হবেই!

- ঠিক আছে, তবে তোমার কথাই রইল! - স্বামীর কথায় নির্ভরতার ছায়া খুঁজে পান হালিমা।[৩]

দুই.

অদূরে মরুধূলির বিক্ষিপ্ত উড়োউড়িও দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে গেল হালিমার। উটের পিঠে বসা স্বামীকে নিরাশ কণ্ঠে বললেন তিনি, আমরা তো আরও পিছে পড়ে গেলাম। এখন তো ওদের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।

- কী আর করা উম্মে আব্দুল্লাহ! তোমার গাধীটিও দুর্বল-শীর্ণকায়, আমার উটনীটিও বয়সের ভারে ন্যুব্জ।

স্বামীর কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে হালিমা।[৪]

ধু ধু মরু। নেই কোন তরু-বীথি; সবুজ ছায়া। নেই পানির কোন উৎস, শুধু মরীচিকা! ওদিকে বিকেল গড়িয়ে মরুভূমির বুকে নামছে আঁধার। দিনভর আলো বিলিয়ে ক্লান্ত সূর্যও ফিরছে আপন নীড়ে। সন্ধ্যার আবছায়ায় পথচলাও কষ্টসাধ্য; দুরূহ! কাফেলার সাথীরাও সবাই খিদেয় জর্জরিত। তাই কাফেলার আমির অবতরণের উপযোগী স্থান খুঁজতে থাকেন।

কিছুটা পথ যেতেই মরু-বালুতে মানুষের পদছাপ চোখে পড়ে তার। তিনি সবাইকে উদ্দেশ করে বলে ওঠেন, ওই দূরে ঠাহর হচ্ছে কোন কূপ আছে। আমরা ওখানেই আজ যাত্রাবিরতি করব।

কাফেলা এসে কূপের সন্নিকটে তাঁবু ফেলে। কিছুক্ষণ পর হালিমা ও তার স্বামীও এসে কাফেলার অন্যদের সাথে মিলিত হন। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দিনের শুভ্র আভাটুকুও নীলিমায় মিলিয়ে গেছে। হালিমার কাছে যতটুকু খাবার ছিল, তা দিনেই শেষ। দুধের শিশুটি ক্ষুধায় ছটফট করছে। হারিস দৌড়ে উটনীর কাছে যান। না, উটনীর ওলানেও বিন্দুমাত্র দুধ নেই। শেষ পর্যন্ত খিদে নিয়েই শিশু আব্দুল্লাহ ঘুমিয়ে পড়ে। সারাদিনের ধকলে হারিস ও হালিমার

শরীরও সায় দেয় না। কিন্তু ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিলেও অনাহারে দুচোখে ঘুম জড়িয়ে আসে না।

রাতের অষ্টপ্রহর। আজ আকাশে নেই সবুজ জোছনা; নেই চাঁদের বিকিরণ। নেই আজ মহাকাশে তারার মিছিল।

ওদিকে কাফেলার সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে সেই কখন। তাদের নিশ্বাসের অদ্ভুতুড়ে শব্দে পরিবেশ আরো ভারী হচ্ছে। কিন্তু বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেই নির্ঘুম রাত উপোস কেটে যায় হারিস ও হালিমার।[৫]

পরদিন সকালেই কাফেলা এসে পৌঁছে মক্কার উপকণ্ঠে। কাফেলার মহিলারা বিভিন্ন বাড়ি-ঘরে গিয়ে দুধ-শিশু আছে কি না, খোঁজ নিতে থাকে। হালিমাও শিশুর খোঁজে বিভিন্ন বাড়িতে যান। দুয়েকটা বাড়ির পর তিনি মক্কার সর্দার আব্দুল মুত্তালিবের বাড়িতে আসেন। তার কোলে আব্দুল মুত্তালিবের নাতি মুহাম্মদকে তুলে দেয়া হল। এতিম শিশু বলে তিনি কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করেন। অন্যশিশুর সন্ধানে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। অন্যান্য মহিলারাও আব্দুল মুত্তালিবের বাড়িতে গেলেন, কিন্তু বাবা না থাকায় কোনো আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যাবে কি না- এই ভাবনায় তারা কেউই মুহাম্মদকে গ্রহণ করলেন না।

অনেক পরিবারে খোঁজ নেয়ার পরও হালিমার ভাগ্যে কোন শিশু জুটল না। অথচ অন্যরা তখন নতুন শিশু নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হালিমার শূন্য হাতে ফিরে যেতে মন মানে না। তিনি স্বামীকে বললেন, এভাবে খালি হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে, ওই এতিম শিশুটিকে নিয়ে গেলে কেমন হয়?

- আমিও তাই ভাবছি! আমার মনে হয়, এর মাঝে কোন মহা-কল্যাণ নিহিত আছে!
স্বামীর সম্মতি পেয়ে হালিমা শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে আসেন।[৬]

তিন.

চারদিক থেকে আঁধার জড়ো হতে শুরু করেছে। আকাশে ভেসে বেড়ানো সূর্যের শেষ লালিমাটুকুও দিগন্তে মিশে গিয়েছে। দ্রুত আকাশের দৃশ্যপট পরিবর্তন হচ্ছে। বাধ্য হয়ে কাফেলা এখানেই রাতযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

সমতল জায়গা থেকে তাঁবু ফেলে হারিস। গতরাতে শিশু আব্দুল্লাহর অনাহারের কথা মনে পড়তেই দৌড়ে যান উটনীর কাছে। আরে এ কী! তার চোখ ছানাবড়া! উটনীর ওলান দেখি দুধে টইটম্বুর। সবটুকু দুধ দোহন করে খুশিমনে তাঁবুতে ফিরে যান তিনি।

স্বামীর চেহারায় আনন্দের ঝিলিক দেখে হালিমা বলে ওঠেন, তোমাকে আজ এত আনন্দিত মনে হচ্ছে কেন?

- গতরাতে তো গলা ভেজানো জন্য সামান্য পানিরও ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আজ দেখি উটনীর ওলান চুইয়ে দুধ গড়িয়ে পড়ছে! - এতটুকু বলে হারিস তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে।

- তাহলে শোনো আরও আনন্দের কথা, গতকাল আব্দুল্লাহকে পান করানোর জন্য বুকে এককোঁটা দুধও ছিল না। কিন্তু আজ এতটা দুধে ভরপুর যে, আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মদ উভয়েই তৃপ্তিভরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে! টু শব্দটিও করেনি!

কৌতুহলবশে হারিস জিজ্ঞাসা করে, তোমার কী মনে হয়, কেন অমন পরিবর্তন?

- আমার মনে হয় সব এই শিশুর সৌজন্যে হচ্ছে। ও আমাদের জন্য সৌভাগ্য হয়ে এসেছে। আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছে! - হালিমার কণ্ঠে দৃঢ় বিশ্বাসের বীণ বেজে ওঠে।

- আমারও একই ধারণা। শিশুটির মাঝে নিশ্চয়ই কোন বিশেষত্ব লুকিয়ে আছে! - স্ত্রীর সাথে একাত্মতা পোষণ করে হারিস।[৭]

পরদিন ভোরেই কাফেলা বাড়ির পথ ধরে। আজ আর হালিমা যাত্রীদলের সবার পেছনে নয়, বরং তার গাধীটি আজ সবার আগে আগে চলছে। কাফেলার সবার চোখে অবিশ্বাস! মুখে বিস্ময়ের ধ্বনি - এ কী করে সম্ভব? যাবার বেলায় যে গাধীটির ধীরগতিতে আমরা বিরক্ত হচ্ছিলাম, সেই গাধীটিই এখন কাফেলার সর্বাগ্রে। তাই হালিমাও খুব সকালে বাড়ি এসে পৌঁছান![৮]

চার.

মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে ছবির মত একটি গ্রাম। আরব্য পল্লী। এখানেই হালিমার বসবাস। তিনি সাদ গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত নারী। মক্কার অধিবাসীদের কাছে এই গ্রামের বেশ নাম-ডাক। কারণ, এখানের বিশুদ্ধ আবহাওয়া ও নির্মল বাতাসে শিশুরা দ্রুত বেড়ে ওঠে । এসব পল্লী-গাঁয়ের মানুষের ভাষাও সুন্দর; সুস্পষ্ট। এখান থেকেই সেকালে গড়ে ওঠতো বিশ্বসেরা কবি-সাহিত্যিক। এমন গ্রামীণ পরিবেশেই রচিত হয়েছে কালজয়ী বহু সাহিত্যগ্রন্থ।

তাই মক্কার কোন অভিজাত পরিবারে শিশু সন্তান জন্ম নিলে, তারা শিশুটিকে এই গ্রামের মহিলাদের কাছে বছর দুয়ের জন্য দত্তক দিতেন। এতে শিশুর শারীরিক বিকাশ যেমন ঘটতো, তেমনি তাদের স্বভাবও হতো কোমল। এমনকি তাদের মখমল হৃদয়ে রেখাপাত করতো প্রাঞ্জল ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ। শুদ্ধ বাচনভঙ্গির অঙ্কুর গজিয়ে উঠতো তাদের হৃদয়-উঠানে। তাই মক্কার সর্দার বনেদী কুরাইশ গোত্রপতি আব্দুল মুত্তালিবও দৌহিত্র মুহাম্মদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার মানসে তাকে হালিমা সাদিয়ার মমতামাখা কোলে তুলে দেন।

হালিমার এখন চার সন্তান। তিন সন্তান- শায়মা, উনায়সা ও আব্দুল্লাহর সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে শিশু মুহাম্মদ।[৯]

মুহাম্মদ আর দশটা শিশুর মতো নয়। খুব শান্তশিষ্ট। শিশুসুলভ দু'চারটে আচরণ ছাড়া সে অন্য শিশুদের মত অস্থির নয়। বরং শিশু হলেও তার অনেক আচরণ পরিণত বয়সের মানুষকেও ভাবিয়ে তোলে। সে দুধমা হালিমার এক স্তনের দুধ পান করে। কিন্তু অপরটি ছুঁয়েও দেখে না, হালিমার শিশুপুত্র আব্দুল্লাহ জন্য রেখে দেয়। হালিমারও তাই মুহাম্মদকে নিয়ে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয় না। বরং মুহাম্মদের কল্যাণে হালিমার গৃহে এসেছে অশেষ বরকত! অসীম নেয়ামত!

চতুর্দিকে তখনও মানুষের হাহাকার। দুর্ভিক্ষ আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। পশুদের খাবারের ঘাস-লতা পর্যন্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু হালিমার বাড়ির অদূরে চারণভূমিতে লকলকিয়ে গজিয়ে উঠেছে সবুজ সবুজ ঘাস। প্রতিদিন সকালে তার বকরির পাল মাঠে যায়, গোধূলি বেলায় দুধে পরিপূর্ণ